জাতীয় শক্তি বা ক্ষমতার ধারণা
Concept of National Power

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কোনোভাবেই শক্তি বা ক্ষমতার ধারণাকে উপেক্ষা করতে পারি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে শক্তির ধারণা প্রতীয়মান হয়ে থাকে। শক্তির ধারণা আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার অন্যতম একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র কতকগুলি মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এগুলিকে সংরক্ষিত ও প্রসারিত করার জন্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাছে শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। মূলত অভ্যন্তরীণ নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভিন্ন জাতি যে ভূমিকা পালন করে থাকে তা নির্ধারিত হয় শক্তির দ্বারাই। এই কারণে কোনো জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শক্তি।

4.1 সংজ্ঞা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল শক্তি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ শক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এই সকল সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে শক্তি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা গ্রহণ করা যেতে পারে। **মরগেনথাউ** বলেছেন যে, যখন অন্যের মন ও কাজের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে শক্তি বলে। শক্তি হল একটি সম্পর্ক। যখন কোনো একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছার দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে থাকে তখন তাকে শক্তি বলে।

জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেন, শক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কষ্টকর কাজ। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, শক্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যদি শক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে এটা দেখা যাবে যে, শক্তির ধারণা অত্যন্ত জটিল। ফলে সীমিত পরিসরে শক্তির ধারণা বর্ণনা করা দুরূহ। বিভিন্ন অর্থে শক্তির ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যেটি লক্ষ করা যায় তা হল শক্তি সম্পর্কে বেশির ভাগ সংজ্ঞাই শক্তিকে একটি সম্পর্ক হিসেবে দেখে থাকে।

কোলৌম্বিস এবং **উলফ্** (Coloumbis and Wolfe)-এর মতানুযায়ী, শক্তির ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁরা বলেছেন, শক্তিকে কেবল বলপ্রয়োগের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটি ঠিক নয়। শক্তির সঙ্গে অনেক ইতিবাচক এবং অহিংস পদ্ধতিও জড়িত থাকে।

অনেকসময় বলা হয়, শক্তি আর প্রভাব সমার্থক ধারণা। কিন্তু এভাবে দেখার কোনো যুক্তিসংগত

কারণ নেই। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করায় তখন তাকে প্রভাব বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভয় দেখানোর কোনো ব্যাপার থাকে না। কিন্তু শক্তির ধারণার সঙ্গে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার যুক্ত থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তি সংক্রান্ত যে ধারণার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে দুটি অনুমান যুক্ত থাকে। এগুলি হল—প্রথমত, যদিও সামরিক সামর্থ্যকেই শক্তি হিসেবে দেখা হয়ে থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে অসামরিক সামর্থ্যগুলিকেও শক্তির আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, শক্তি পরিমাপযোগ্য এবং এই ধারণাটি সংখ্যার মাধ্যমেও ব্যক্ত করা যায়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে শক্তি সমাদৃত হয়ে থাকে। তবে লক্ষণীয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পের্কের আলোচনায় মূলত জাতীয় শক্তির ধারণাই আলোচিত হয়ে থাকে। জাতীয় শক্তি বলতে **মরগেনথাউ** বুঝিয়েছেন, একটি জাতির মন ও কাজের ওপর যখন অন্য কোনো জাতি ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

4.2 জাতীয় শক্তির উপাদান

জাতীয় শক্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে এর কতকগুলি উপাদান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় শক্তির সঙ্গে কতকগুলি উপাদান জড়িয়ে থাকে। এদের সমন্বয়েই জাতীয় শক্তির আসল চরিত্র অনুধাবন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাতে এগুলিকে সামর্থ্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। এগুলি হল—

প্রথমত, শক্তির যে সকল উপাদান আছে সেগুলির ভূমিকা সদা সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই কারণে বলা যায় যে, শক্তির বিভিন্ন উপাদানগুলির আপেক্ষিক ভূমিকা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

দ্বিতীয়ত, একটি রাষ্ট্রের শক্তির যে সকল উপাদান থাকে তা জড়িয়ে থাকে অন্য রাষ্ট্রের শক্তির সব উপাদানের সঙ্গে।

তৃতীয়ত, কোনো একটি নির্দিষ্ট উপাদানের সাহায্যে শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, শক্তি নির্ভর করে শক্তির উপাদানগুলির ব্যবহারের ওপর। শক্তির অনেকগুলি উপাদান রয়েছে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তবে **ফ্রাঙ্কেল** শক্তির পাঁচটি উপাদানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) জনসংখ্যা, (২) ভূগোল, (৩) অর্থনীতি, (৪) মনস্তত্ত্ব, (৫) সামরিক বাহিনী।

(১) জনসংখ্যা ঃ জনসংখ্যা হল জাতীয় শক্তির অন্যতম একটি নির্ধারক। জাতীয় শক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের ওপর নির্ভর করে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি। এ ক্ষেত্রে যেটি একান্তভাবে কাম্য তা হল দেশের জনসংখ্যা এমন হওয়ার দরকার যাতে দেশের প্রয়োজন এবং সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। তবে এ ব্যাপারে যেটা মনে রাখতে হবে তা হল, দেশের জনগণকে অবশ্যই দক্ষ এবং শিক্ষিত হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে দেশের সম্পদকে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আর তা না হলে জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটবে। দেশের মানুষ দ্বারা উৎপাদিত জাতীয় সম্পদ কোনো দেশের জাতীয় শক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক বেশি হওয়া উচিত নয়। এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অত্যধিক জনসংখ্যা সম্পন্ন দেশ অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় সেই দেশটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয় না।

প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তার জন্য সেই দেশের উচিত পর্যাপ্ত পরিমাণের সামরিক বাহিনীর। কোনো

দেশের জাতীয় শক্তি নির্ভর করে সেই দেশের সেনাবাহিনীর সংখ্যার ওপর। সেজন্য বলা যায় যে, শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যার।

জনসংখ্যার গুরুত্ব সত্ত্বেও এটা মনে রাখা দরকার, জনসংখ্যাকে কোনো দেশের শক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। একটি দেশকে তখনই শক্তিশালী হিসেবে অভিহিত করা হবে যখন সেই দেশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকবে। তা ছাড়া জনগণের শক্তি, সামর্থ্য, উৎপাদন করার ক্ষমতা, গুণগত মান, চারিত্রিক উৎকর্ষতাও কোনো দেশের জাতীয় শক্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(২) ভূগোল ঃ ভূগোলকে জাতীয় শক্তির প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। জাতীয় শক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ভূমিকাটিকে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি হল—(ক) ভৌগোলিক অবস্থান; (খ) ভূ-ভাগের আয়তন; (গ) জলবায়ু; (ঘ) আকৃতি ও ভূপ্রকৃতি।

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কোনো দেশের শক্তির নির্ধারক হিসেবে সেই দেশের অবস্থান নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর সেই দেশের নিরাপত্তা অনেকটাই নির্ভর করে। কোন্ দেশ সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে বা কোন্ দেশ স্থলশক্তি হিসেবে উত্তীর্ণ হবে তা নির্ভর করে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির পশ্চাতে তার ভৌগোলিক অবস্থানের একটা ভূমিকা আছে। পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলপথ দ্বারা বেষ্টিত। ফলে এই দেশটির বাইরে থেকে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে থাকে। সমুদ্রের নিকট অবস্থানকারী দেশ জলপথ ব্যবহার করে তার ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করতে পারে। একসময় ব্রিটেন এই জলপথ ব্যবহার করে প্রায় সমগ্র বিশ্বে তার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই কারণে বলা হয় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর কোনো দেশের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সেই দেশটি কী ভূমিকা পালন করে তাও এর ওপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান তাদের বিশ্ব-রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে উত্তীর্ণ করেছে। এই কারণে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশই এই অঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।

(খ) ভূ-ভাগের আয়তন ঃ কোনো দেশের শক্তির নির্ধারক হিসেবে ভূ-ভাগের আয়তনের গুরুত্বও অপরিসীম। যদি কোনো দেশের আয়তন বিশাল হয় তাহলে সেই দেশে প্রচুর সংখ্যক মানুষ বসবাস করতে পারবে। তা ছাড়া, এ রকম দেশে অনেক ধরনের সম্পদ পাওয়া যাবে। আবার সামরিক দিক থেকেও বিশাল আয়তন দেশের গুরুত্বও প্রণিধানযোগ্য। এরূপ দেশকে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র সহজেই আক্রমণ করতে পারে না। আবার এরূপ দেশকে কোনোভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম হলেও তাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভূ-ভাগের আয়তন ও জাতীয় শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। অরগান্‌স্কি (Organski)-র মতানুযায়ী কার শক্তি বেশি—ক্ষমতা না আয়তনের—তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা সহজে বুঝতে পারি না যে ক্ষমতা আয়তনকে নির্ধারণ করে, না আয়তন নির্ধারণ করে ক্ষমতাকে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গ্রেট ব্রিটেন আয়তনের দিক থেকে অত্যন্ত ছোটো একটি দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একসময় এই দেশটি এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল এবং প্রায় সমগ্র বিশ্বে তার আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

(গ) জলবায়ু ঃ কোনো দেশের জলবায়ু নির্ধারিত হয়ে থাকে সেই দেশের অবস্থানের উপর। কোনো দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, আর্থনীতিক অবস্থা, জনগণের স্বাস্থ্য এবং তাদের উৎপাদন করার ক্ষমতা নির্ভর করে সেই দেশের জলবায়ুর ওপর। কোনো দেশের জাতীয় শক্তি নির্ভর করে এবং তার বৃদ্ধি ঘটে যদি উপরিউক্ত বিষয়গুলি অনুকূল হয়। এ ব্যাপারে অনেকসময় বলা হয়ে থাকে, কোনো দেশ যদি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থান করে তাহলে সেই দেশ বৃহৎ শক্তি হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে। তবে এও ঠিক যে, বর্তমান কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। এর ফলে জাতীয় শক্তির একটি নির্ধারক হিসেবে জলবায়ুর গুরুত্ব অনেকটা কমে গিয়েছে।

(ঘ) আকৃতি ও ভূপ্রকৃতি ঃ ভূপ্রকৃতিও জাতীয় শক্তির নির্ধারকরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূপ্রকৃতির দ্বারা কোনো দেশের যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়ে থাকে। দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের যোগাযোগ এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর। তবে মনে রাখতে হবে যে, দেশের ভূপ্রকৃতিতে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা থাকলেই চলবে না। শুধু এর দ্বারা দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি হয় না। এ ক্ষেত্রে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল দেশের প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাকে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। এর ওপরই নির্ভর রবে জাতীয় শক্তি।

জাতীয় শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল ভূগোল। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ভূগোল কখনোই জাতীয় শক্তির মুখ্য উপাদান নয়। এরূপ ধারণা যদি পেশ করা হয়, তাহলে সেটি হবে অতিরঞ্জিত একটি ধারণা। এককথায় বলতে গেলে বলা যায়, ভৌগোলিক উপাদান জাতীয় শক্তির একমাত্র নির্ধারক নয়, এটি হল জাতীয় শক্তির অন্যতম একটি প্রধান নির্ধারক।

(৩) অর্থনীতি : অর্থনীতি জাতীয় শক্তির একটি নির্ধারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে কোন্ কোন্ বিষয়কে কোনো জাতির অর্থনীতির শক্তির মানদণ্ড হিসেবে ধরা হবে সেই বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আর্থনীতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এগুলি হল—শিল্পায়ন, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার। প্রতিটি জাতি আর্থনীতিক অগ্রগতিকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। জাতীয় শক্তির নির্ধারকরূপে অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, বেশি পরিমাণের কাঁচামালের অস্তিত্ব আর্থনীতিক দিক থেকে দেশের শক্তিকে নির্ধারণ করে থাকে। দেশের কম কাঁচামাল থাকলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে অনেকসময়ই কাঁচামালের ঘাটতি দূর করার জন্য অনেক দেশ পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। অবশ্য এটা লক্ষ রাখতে হবে যে, দেশের উৎপাদনের সামর্থ্য এবং বাস্তব উৎপাদনের মধ্যে একটি তারতম্য নির্ধারণ করা দরকার।

(৩) মনস্তত্ত্ব : জাতীয় শক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে জাতীয় আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক শক্তিকে গণ্য করা যেতে পারে। এদের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একটি জাতি তখনই শক্তিশালী জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে যখন সেই জাতিটি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবে এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে **হার্টম্যান** বলেছেন যে, জাতীয় শক্তির মূল্যায়নে মানুষের জাতীয় চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৪) সামরিক বাহিনী : কোনো দেশকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে তখনই আখ্যায়িত করা হবে যখন সেই দেশটি সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হবে। যুদ্ধ এবং শান্তি—উভয় অবস্থাতেই সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে বলা হয় যে, কোনো দেশের শক্তির অনেকাংশেই নির্ভর করে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা, তার গুণগত মান ও আধুনিকীকরণের মাত্রা এবং ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতার উপর। এজন্য

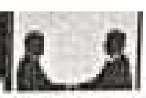

সামরিক বাহিনীকে জাতীয় শক্তির একটি অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কোনো দেশের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী হতেই হবে। তা না হলে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার দিক থেকে সেই দেশটি দুর্বল হয়ে পড়বে। এই কারণে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিককালে প্রতিটি দেশই অন্য দেশের তুলনায় সামরিক দিক থেকে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে চায় এবং এই শক্তিকে সে অন্য দেশের আক্রমণাত্মক নীতি ও কার্যাবলিকে প্রতিহত করার কাজে ব্যবহার করে।

4.3 জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হল জাতীয় শক্তি। কিন্তু বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক রাষ্ট্র তার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে সচেস্ট থাকে। এর ফলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিজের শক্তি বর্ধনের দিকে মনোনিবেশ করে। এর ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু কোনোভাবেই এটি কাম্য নয়। জাতীয় শক্তির কতকগুলি সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল—

(১) সমালোচকরা বলেন, জাতীয় শক্তি পরিমাপ করার পদ্ধতি সঠিক নয়। জাতীয় শক্তি পরিমাপের জন্য যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যবাহিনীর ন্যায় কতকগুলি সামরিক উপাদানগুলিকে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু একটি দেশের সামরিক উপাদান সম্পর্কে অন্য দেশ যে ধারণা পোষণ করে, তা সবই অনুমানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। আবার, আধুনিকীকরণের দ্বারা কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন সাধন করা যায়। এই কারণে বলা যায় যে, বর্তমান সময় কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি যে অবস্থায় বিরাজ করে, পরবর্তী সময় সেই অবস্থায় নাও থাকতে পারে।

(২) সাম্প্রতিককালে প্রায় সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রসার সাধন ঘটেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই গণতন্ত্র জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যায়, জনগণ শক্তি বৃদ্ধি করার চেয়ে অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সরকারকে দৃষ্টি দেওয়ার ওপর জোর দেয়। কোনো গণতান্ত্রিক সরকার এটিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

(৩) জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কোনো একটি মাত্র উপাদানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক নয়। কোনো একটি সময় জাতীয় শক্তির কোনো একটি উপাদান অন্য উপাদানের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এইজন্য বিভিন্ন সময় জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু সমালোচকরা বলেন এটি ঠিক নয়।

(৪) জাতীয় শক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করলে এটা মনে হতে পারে, ক্ষমতা বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শক্তি বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হওয়ায় এদের আন্তর্জাতিক আইন মেনে কাজ করতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থের ধারণা
Concept of National Interest in International Relation

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল জাতীয় স্বার্থ। সাম্প্রতিক কালে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে কোন্ রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের দ্বারা। এসব কারণে বলা হয়ে থাকে, জাতীয় স্বার্থ পররাষ্ট্রনীতির একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। **ফ্রাঙ্কেল** (Frankel)-কে অনুসরণ করে তাই বলা যায়, জাতীয় স্বার্থ হল পররাষ্ট্রনীতির একটি মুখ্য ধারণা। তিনি আরও বলেছেন, লাভক্ষতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক পরিচালিত হয়ে থাকে। জাতীয় স্বার্থ বলতে তিনি এই লাভক্ষতির হিসাবকেই বুঝিয়েছেন।

5.1 সংজ্ঞা

এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই যে পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ধারণা হল জাতীয় স্বার্থ। কিন্তু এ সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনো ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থের ধারণাটির অর্থ কী সে সম্পর্কেও কোনো পরিষ্কার ধারণা দেওয়া যায় না। এ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদানে উদ্যোগী হয়েছেন।

আবদুল আজিজ সৈদ (Abdul Aziz Sayed)-এর মতে, নীতি নির্ধারণকারীগণ রাজনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে কতকগুলি মূল্যবোধজনিত ধারণা প্রয়োগ করে থাকেন। এগুলিকে জাতীয় স্বার্থ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, কতকগুলি রাষ্ট্রের, জাতির এবং সরকারের কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী, নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বজনীন উদ্দেশ্য থাকে। এগুলিই হল জাতীয় স্বার্থ। এর দ্বারাই একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। প্রায় অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন **হলস্টি** (Holsti)। তিনি বলেছেন, জাতীয় লক্ষ্য ব্যাখ্যার মাধ্যম হিসেবে জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

লারচে (Lerche) এবং **সৈদ** (Sayed) রাজনৈতিক কার্যকলাপের বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নীতি প্রণয়নকারীরা মূল্যবোধজনিত

বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ধারণা ব্যবহার করেন। এটিই হল জাতীয় স্বার্থ। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়।

বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে **মরগেনথাউ** (Morgenthau)-ও জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় স্বার্থ হল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল নির্যাস। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জাতীয় স্বার্থের ধারণা ব্যতীত অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, দেশের পররাষ্ট্রনীতি বোঝার ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি স্থির নয়। এটা একটি সদা সর্বদা পরিবর্তনশীল ধারণা। কোনো দেশের বিদেশনীতি নির্ধারিত হয় কতকগুলি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। আর এসব বিষয়ের ওপর দেশের জাতীয় স্বার্থের ধারণা নির্ভর করে। **মরগেনথাউ** এই মন্তব্য পোষণ করেছেন, জাতীয় স্বার্থের ধারণা তখনই দেখতে পাওয়া যায় যখন বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে আপস হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা দরকার, দেশের সামর্থ্যের সঙ্গে তার জাতীয় স্বার্থের সামঞ্জস্য থাকা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো জাতি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ সম্বন্ধেই শুধুমাত্র ওয়াকিবহাল থাকে না। অন্যদিকে, সে অন্য জাতির স্বার্থ সম্পর্কেও সচেতন থাকে। **মরগেনথাউ** রাষ্ট্রের কাজকর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

যদিও **ফ্রাঙ্কেল** জাতীয় স্বার্থের ধারণাটিকে পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য ধারণা হিসেবে গণ্য করেছেন, তবুও তিনি এও বলেছেন জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি অস্পষ্ট। জাতীয় স্বার্থের ধারণাটিকে তিনি জাতীয় মূল্যবোধের সমাহার বলে গণ্য করেছেন। জাতীয় স্বার্থ হল একটি সাধারণ এবং নিরবচ্ছিন্ন লক্ষ্য, আর এটিকে লাভ করার জন্য প্রতিটি জাতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে।

অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেল জাতীয় স্বার্থের ধারণাটিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এগুলি হল—

প্রথমত, রাষ্ট্রের কয়েকটি আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার জন্যই জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি গড়ে তোলা হয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের বাস্তব পরিস্থিতি আছে। এটি বলতে সেই পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় যখন কোনো দেশ তার কর্মসূচি অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।

তৃতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের আবার বিশ্লেষণাত্মক অবস্থা আছে। এটি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন কোনো দেশের সরকার তার নির্দিষ্ট বিদেশনীতিকে মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতির দ্বারা যেভাবে ব্যাখ্যা এবং সমর্থন করে থাকে।

5.2 উদ্দেশ্য

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই বিদেশনীতি প্রণয়ন করতে হয়। আর এই বিদেশনীতি প্রণয়ন করার সময় জাতীয় স্বার্থ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় স্বার্থের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল—(১) ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষা করা, (২) মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাতীয় মর্যাদা, শক্তি ও কল্যাণসাধনকে সংরক্ষণ করা।

প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষা করা। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার অভিপ্রায়ে প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্র যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং ঠান্ডা যুদ্ধে আক্রান্ত বিশ্বে পুঁজিবাদী দেশগুলি স্বীয় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা

করার উদ্দেশ্যে ন্যাটো (NATO) নামে একটি সংগঠন গঠন করে। একইভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য **ওয়ারশ চুক্তি** (Warsaw-Treaty)-তে আবদ্ধ হয়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, কেবলমাত্র ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা রক্ষা করার মধ্যে জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি সীমাবদ্ধ থাকে না। মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে জাতীয় লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে থাকে।

মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার বাসনা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সূচিত করে।

এ ছাড়া, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্য বা প্রশ্নটি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নগুলিও জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার তাগিদ একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ অন্য রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় সামিল হন। তবে যখন নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়, তখনই অন্য রাষ্ট্রকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

5.3 সীমাবদ্ধতা

কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি কেন্দ্রীয় নির্ধারক হল জাতীয় স্বার্থ। জাতীয় স্বার্থ হল একটি মৌলিক নির্ধারক যার দ্বারা দেশের বিদেশনীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। জাতীয় স্বার্থের গুরুত্ব সত্ত্বেও এই ধারণাটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল—

(১) পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হওয়া সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, ইচ্ছানুযায়ী কোনো রাষ্ট্র নিজের জাতীয় স্বার্থ অন্য রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরই কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের বাস্তবায়ন নির্ভর করে।

(২) পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রত্যেক রাষ্ট্রই জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় কোনো রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সমস্যা ও স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে না।

(৩) সমালোচকগণ বলেছেন, জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি হল আপেক্ষিক, অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট। সেই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করেই জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব। রেমন্ড অরোঁ (Raymond Aron) অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রে সমাজের বিভিন্ন অংশ থাকে। আর এদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের মধ্যে বহুমুখীনতা পরিলক্ষিত হয়।

(৪) জাতীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধতা আলোচনা প্রসঙ্গে **কোলৌম্বিস্ ও উল্ফ** (Coloumbis and Wolfe)-এর ধারণা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেছেন, জাতীয় স্বার্থ ধারণাটি সম্পর্কিত কিছু

প্রশ্ন আছে। আর এগুলিকে কেন্দ্র করে কতকগুলি মতপার্থক্য দেখতে লক্ষ করা। এগুলি হল—

(ক) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো দেশে জনগণের জাতীয় স্বার্থ বলতে কী বোঝায়?

(খ) কোন্ অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় কর্মসূচি নিরূপণ করা হবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত করা হবে?

(গ) কীভাবে শত্রু আর বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হবে?

শক্তি সাম্য

ভূমিকা

শক্তি সাম্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বহু কাল থেকে প্রভাবিত করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অত্যন্ত পুরোনো ধারণা হল শক্তি সাম্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মৌলিক নীতি হিসেবেও শক্তি সাম্যকে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রায় তিন শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শক্তি সাম্যের ধারণার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। শক্তি সাম্যের ধারণা ব্যবহার করা হয় মূলত ১৬৪৮ সাল থেকে ১৯১৪ সালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে ইতিহাস বিবেচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে শক্তি সাম্যের ধারণাটির ব্যাপ্তি ঘটে ১৮১৫ সালের **ভিয়েনা বন্দোবস্তের** পর থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা দেখা যায় যে, এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থানীয় সম্পর্কের ব্যাপারে শক্তি সাম্যের নীতিটি অনুসরণ করত। শক্তি সাম্যের ধারণায় ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকায় একটি মাত্র রাষ্ট্র অবতীর্ণ হতে পারে, আবার একাধিক রাষ্ট্রও মিলিতভাবে এই ভূমিকা পালন করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ব্রিটেন এই ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছিল।

7.1 সংজ্ঞা

শক্তি সাম্যের ধারণাটির সংজ্ঞা নিরূপণ করার সময় প্রথমেই লক্ষ রাখতে হবে এই ধারণাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে এই ধারণাটির সঙ্গে একটি ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, আর সেটি হল ভারসাম্যের ধারণা। এর অর্থ হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে কোনো একটি দেশ অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে। আর এটি রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

জর্জ সোয়ার্জেনবার্জার (George Schwarzenberger) বলেছেন, শক্তি সাম্য হল ভারসাম্য অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণের স্থিতিশীল অবস্থা।

সিডনী বি. ফে (Sydney B. Fay) এই অভিমত পেশ করেছেন যে, শক্তি সাম্য হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের

ক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি ন্যায়সংগত স্থিতিশীলতা যার ফলে কোনো একটি রাষ্ট্র অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার ইচ্ছা যাতে অন্যের ওপর আরোপ করতে না পারে।

হ্যান্স জে. মরগেনথাউ (Hans J. Morgenthau) শক্তি সাম্যকে একটি সাধারণ সামাজিক নীতির এক বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। তিনি শক্তি সাম্য বলতে বুঝিয়েছেন একটি বাস্তব পরিস্থিতি যেখানে অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় সমতার ভিত্তিতে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়ে থাকে।

কুইন্সি রাইট (Quincy Wright)-এর মতে, শক্তি সাম্য হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য জোটের সম্মুখীন হতে হয়।

সি. পি. শ্লেইচার (C. P. Schleicher) তিনটি দিক থেকে শক্তি সাম্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলি হল—

(১) শক্তির যে-কোনো বণ্টন,

(২) এই বণ্টন ব্যবস্থায় কিছু রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় শক্তিশালী এবং

(৩) এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের অবস্থিতি।

কলৌম্বিস এবং উল্ফ্ (Coloumbis and Wolfe) শক্তি সাম্যের ধারণাটির **পাঁচটি** বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। এগুলি হল—

(১) বহু সংখ্যক সার্বভৌম রাজনৈতিক কারকের অবস্থিতি।

(২) এই সকল সার্বভৌম কারকের ওপর একটি কেন্দ্রীভূত, বৈধ এবং শক্তিশালী কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি।

(৩) মর্যাদা, সম্পদ, আয়তন এবং ক্ষমতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অসম বণ্টন।

(৪) সীমিত বিশ্বসম্পদের জন্য সার্বভৌম রাজনৈতিক কারকের মধ্যে নিরন্তর অথচ নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা এবং বিরোধ।

(৫) বৃহৎ ক্ষমতাগুলির শাসকদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়ার অবস্থিতি যে বিদ্যমান ক্ষমতার বণ্টন তাদের পারস্পরিক সুবিধা প্রদান করে।

পামার এবং পারকিন্স (Palmer and Parkins) শক্তির সাম্যের **সাতটি** বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) শক্তি সাম্য কোনো অনড় অবস্থা নয়। অন্যদিকে এটি একটি ভারসাম্যের অবস্থা। কিন্তু এই ভারসাম্যের অবস্থা সদা সর্বদা পরিবর্তনশীল।

(২) শক্তি সাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা। শক্তিসাম্য হল একটি কূটনৈতিক কৌশল। এই কৌশল দ্বারা রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী হয়। এই কারণে অনেকসময়ই প্রাধান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

(৩) মানব ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে শক্তি সাম্যের তত্ত্বটিকে পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল করে তোলা দরকার।

(৪) বাস্তবে শক্তি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করে বলা যায় যে, বিশুদ্ধ শক্তি সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

(৫) বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শক্তি সাম্যের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

(৬) গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র কোনো অবস্থাতেই শক্তি সাম্যের ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

(৭) শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলিই শক্তি সাম্যের ধারণাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই রাষ্ট্রটি শক্তি সাম্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয় না। কিন্তু ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

7.2 বিভিন্ন ধরন বা রূপ

বিভিন্ন নির্ধারকের ওপর ভিত্তি করে শক্তি সাম্যের ধারণাটির বিভিন্ন ধরন বা রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এলাকার ভিত্তিতে বা অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের শক্তি সাম্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এলাকা বা ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, শক্তি সাম্য চার ধরনের হতে পারে। এগুলি হল—স্থানীয়, আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্বব্যাপী।

(১) যখন দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি সাম্য কার্যকর হয়, তখন তাকে **স্থানীয় শক্তি সাম্য** বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেন-ফ্রান্স, ইরাক-ইরান বা ভারত-পাকিস্তানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(২) **আঞ্চলিক শক্তি সাম্য** বলতে বোঝায় সেই অবস্থাকে যখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থানকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শক্তি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) শক্তি সাম্য আবার **মহাদেশীয়** হতে পারে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় এরূপ শক্তি সাম্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধকে মহাদেশীয় শক্তি সাম্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

(৪) বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছুটা হলেও একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এসব বিভিন্ন কারণের জন্যই বিশ্বব্যাপী শক্তি সাম্যের ধারণাটি গুরুত্ব লাভ করেছে। বলা হয় যে, স্থানীয়, আঞ্চলিক অথবা মহাদেশীয় ভারসাম্যের ধারণাগুলি এই **বিশ্বব্যাপী শক্তি সাম্যের** ধারণাটির মধ্যে কার্যকরী হয়ে থাকে।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে শক্তি সাম্যের ধারণাটিকে **তিন** ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল—দ্বিকেন্দ্রিক, ত্রিকেন্দ্রিক এবং বহুকেন্দ্রিক শক্তি সাম্য।

(১) যখন দেখা যায় যে, শক্তি সাম্য রক্ষার্থে দুটি রাষ্ট্র বা দুটি শিবির ভূমিকা পালন করছে, তখন তাকে **দ্বি-কেন্দ্রিক শক্তি সাম্য** বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে দ্বি-মেরুবাদে বিভক্ত পৃথিবী দেখা গিয়েছিল, তাকে দ্বি-কেন্দ্রিক শক্তি সাম্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের শক্তি সাম্যের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এই ধরনের শক্তি সাম্য ততটা বেশি কাম্য বা স্থিতিশীল নয়।

(২) শক্তি সাম্য রক্ষার্থে যখন তিনটি রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হয়, তখন তাকে **ত্রি-কেন্দ্রিক শক্তি সাম্য** বলে গণ্য করা হয়।

(৩) আবার অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে শক্তি সাম্য দেখা গিয়েছিল, তাকে **বহুকেন্দ্রিক শক্তি সাম্য** বলা হয়। এরূপ শক্তি সাম্যে বহু রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

শক্তি সাম্যের আরও অনেক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। **এফ. এইচ. হার্টম্যান** (F. H. Hartmann) 'The Relations of Nations' গ্রন্থে বলেছেন যে, শক্তি সাম্যের দুটি রূপ হতে পারে। এগুলি

হল—সাধারণ এবং আঞ্চলিক। তিনি বলেছেন যে, দীর্ঘকাল আঞ্চলিক শক্তি সাম্য ইউরোপে বিরাজমান ছিল। একটা সময় পর্যন্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম ইউরোপের আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করত। অন্যদিকে, পূর্ব ইউরোপের আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করত রাশিয়া, প্রাশিয়া ও পোল্যান্ড। হার্টম্যান বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুটি বৃহৎ শক্তির উদ্ভব হয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর ফলে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণ ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। আঞ্চলিক শক্তি সাম্য সাধারণ শক্তি সাম্যের মধ্যে বিরাজ করতে পারে। আবার কখনো বা এদের মধ্যে পৃথকীকরণ সূচিত হয়। অনেকসময় আবার দেখা যায় যে, সাধারণ ভারসাম্যের মূলকেন্দ্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য থাকতে পারে। কখনো বা এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে যখন সাধারণ ভারসাম্য আঞ্চলিক ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

শক্তি সাম্যের আরও অনেক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে শক্তি সাম্য নমনীয় হতে পারে, আবার অন্যদিকে শক্তি সাম্য অনমনীয়ও হতে পারে। এ ছাড়া, শক্তি সাম্য সরলও হতে পারে, আবার জটিলও হতে পারে।

7.3 পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ

শক্তি সাম্য কোনো অনড় ব্যবস্থা নয়। এটা সদা সর্বদা পরিবর্তনশীল একটি ব্যবস্থা। এই ধারণাটির দ্বারা একটি অস্থায়ী অবস্থার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। শক্তি সাম্যের অবস্থা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি কৌশল বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ এই সকল কৌশল বা পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করেছেন।

অধ্যাপক পামার ও পারকিন্‌স্ ছ'টি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে শক্তি সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। এগুলি হল—

(১) জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন; (২) ক্ষতিপূরণ; (৩) সশস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ; (৪) হস্তক্ষেপ ও না-হস্তক্ষেপ; (৫) 'বাফার' (Buffer) বা ব্যবধান রাষ্ট্র গঠন ও (৬) বিভাজন ও শাসন।

অনুরূপভাবে **হ্যান্স জে মরগেনথাউ** (Hans J. Morgenthau) শক্তি সাম্য রক্ষার জন্য **ছ'টি** পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) বিভাজন ও শাসন; (২) ক্ষতিপূরণ; (৩) সশস্ত্রীকরণ; (৪) জোট গঠন; (৫) জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন ও (৬) ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী।

অধ্যাপক হার্টম্যান (Hartmann) আবার শক্তি সাম্য রক্ষা করার **পাঁচটি** পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) জোট গঠন; (২) এলাকা দখল; (৩) 'বাফার' বা মধ্যবর্তী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; (৪) বন্ধু রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস; (৫) শত্রু রাষ্ট্র যাতে নতুন জোট গঠন করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে সেই রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস।

শক্তি সাম্য রক্ষা করার এতগুলি পদ্ধতির মধ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন ঃ

জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠনকে শক্তি সাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। বলা হয় যে, শক্তি সাম্য লাভ করার এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। জোট গঠনের মাধ্যমেই কোনো

রাষ্ট্র নিজের শক্তির সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের শক্তির সংযোগসাধন করতে পারে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠনের অর্থ হল কোনো জোটের বিপক্ষে বিরুদ্ধ জোট গঠন করা। জোট বহু প্রকারের হতে পারে—(১) আক্রমণাত্মক জোট; (২) আত্মরক্ষামূলক জোট; (৩) কার্যকর জোট; (৪) অকার্যকর জোট; (৫) স্থায়ী জোট; (৬) অস্থায়ী জোট; (৭) সমজাতীয় জোট; (৮) অনুপূরক জোট; (৯) নিরপেক্ষ জোট; (১০) পক্ষপাতিত্বমূলক জোট; (১১) মতাদর্শগত জোট; (১২) পারস্পরিক জোট; (১৩) একপাক্ষিক জোট; (১৪) সার্বজনীন জোট ও (১৫) সীমিত জোট।

(খ) বাফার বা মধ্যবর্তী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঃ

বাফার বা মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় তাদের ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এই রাষ্ট্রগুলি অবস্থান করে দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে। মধ্যবর্তী অবস্থায় রাষ্ট্রটি থাকার ফলে দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রই সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ, দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ কমাতে এবং তাদের মধ্যেকার ব্যবধান বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই বাফার রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বাফার রাষ্ট্রটি নিরপেক্ষ চরিত্রবিশিষ্ট হতে পারে বা কোনো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে পারে বা অধীনস্থ রাষ্ট্রও হতে পারে। এভাবেই দুই বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে বাফার রাষ্ট্র ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসের পাতায় বাফার রাষ্ট্রের অনেক উদাহরণ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে বাফার রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেছিল। অনুরূপভাবে বহুবছর ধরে আফগানিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাশিয়ার মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করেছিল। একইভাবে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হত।

(গ) বিভাজন ও শাসন ঃ

শক্তি সাম্য রক্ষা করার একটি অন্যতম ও প্রাচীন পদ্ধতি হল এই বিভাজন ও শাসনের কৌশল। এই পদ্ধতি দ্বারা একটি রাষ্ট্রকে অনেকগুলি অংশে বিভক্ত করা হয়। এর সুবিধা হল যে, এর দ্বারা এই বিভিন্ন অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে শাসন করা সহজ হয়। এর ফলে নিজের ক্ষমতা সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। ব্রিটেন তার উপনিবেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এই নীতি অনুসরণ করত। একইভাবে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ফ্রান্স জার্মানির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করত।

(ঘ) ক্ষতিপূরণ ঃ

শক্তি সাম্যের ধারণার সঙ্গে ক্ষতিপূরণের ধারণাটি অনেক প্রাচীন কাল থেকে জড়িত। এটিকে শক্তি সাম্যের একটি প্রচলিত ধারণা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যখন পুরানো কোনো ভূখণ্ড ভাগ করা হয় বা নতুন কোনো ভূখণ্ড দখল করা হয় তখন ক্ষতিপূরণের নীতিটি কার্যকর করা হয়।

(ঙ) সশস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ ঃ

সশস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ—উভয়কেই শক্তি সাম্য রক্ষা করার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সশস্ত্রীকরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র আধুনিক অস্ত্র উৎপাদন করতে ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। এর মাধ্যমে শক্তি সাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে অনেক রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু শক্তি সাম্য রক্ষা করার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই শান্তি রক্ষা করা যেতে পারে। এককথায় বলতে গেলে বলা যায়, নিরস্ত্রীকরণ শক্তি সাম্য রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য পদ্ধতি।

(চ) হস্তক্ষেপ ও না-হস্তক্ষেপ ঃ

হস্তক্ষেপ করার নীতিটিকে শক্তি সাম্য লাভ করার একটি বহু প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিই এই ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কৌশলের দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের নীতিকে বোঝায়। অতীতকাল থেকেই ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রগুলি এই ভারসাম্যের নীতিকে প্রয়োগ করেছে। বিভিন্ন ভাবে এই নীতি কার্যকর করা হয়ে থাকে। যেমন—কোনো দেশের গৃহযুদ্ধে ইন্ধন প্রদান করা, প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ করা, নাশকতামূলক কাজকর্ম চরিতার্থ করা। অনেকসময় আবার হুমকির আশ্রয়ও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবার হস্তক্ষেপ করার নীতির বিপরীত নীতি হল না-হস্তক্ষেপ করার কৌশল। এর দ্বারাও শক্তি সাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। স্থিতাবস্থা (statusquo) বজায় রাখার জন্য অনেকসময় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এই নীতি অনুসরণ করে। আর ছোটো ছোটো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাষ্ট্রও এই নীতিটি অনুসরণ করতে বিশেষ আগ্রহী থাকে।

7.4 কার্যকারিতা বা উপযোগিতা

একদা শক্তি সাম্য শান্তিরক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর সাবেকি শক্তি সাম্যের ধারণার অবসান সূচিত হয়। তা সত্ত্বেও শক্তি সাম্যের ধারণার গুরুত্ব বা উপযোগিতাকে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখা যায় না।

প্রথমত, শান্তিরক্ষায় শক্তি সাম্যের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে শক্তি সাম্য সাহায্য করেছে। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে শক্তি সাম্যের ধারণাটি সোচ্চার হয়েছে। বর্তমানে শান্তিরক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অতীতে এদের অস্তিত্ব ছিল না। এই কারণে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে শক্তি সাম্য একমাত্র উপায় বলে পরিগণিত হত।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ছোটো বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা এবং অস্তিত্ব রক্ষায় শক্তি সাম্যের ভূমিকা ছিল। আঞ্চলিক শক্তি সাম্য প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের অধীনতা ও প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কোনো বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে মনে হলে তা প্রতিরোধ করার এবং শক্তি সাম্য রক্ষা করার অভিপ্রায়ে অন্যান্য রাষ্ট্র ছোটো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে সোচ্চার হয়েছে।

তৃতীয়ত, যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে শক্তি সাম্যের ভূমিকা আছে। শক্তি সাম্য বজায় থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয় না। এই কারণে বলা যায়, শক্তি সাম্য দ্বারা একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক বিশেষজ্ঞ এজন্য এই অভিমত পেশ করেছেন যে, শক্তি সাম্যের পতনের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতায় রক্ষার ক্ষেত্রে শক্তি সাম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শক্তি সাম্য নীতিটি প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষিত হয়।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক আইন এবং কূটনীতি কার্যকর করার ব্যাপারে শক্তি সাম্যের ভূমিকা আছে। কারণ এগুলি কার্যকর করার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন হয় তা রক্ষায় শক্তি সাম্য সাহায্য করে থাকে।

■ **সমালোচনা ঃ**

শক্তি সাম্যের ধারণাটির গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটিকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দিক থেকে শক্তি সাম্য তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। শক্তি সাম্যের বিরুদ্ধে আনীত সমালোচনাগুলি হল নিম্নরূপ :

প্রথমত, শক্তি সাম্যের তত্ত্বটিতে বলা হয়েছে, এই ধারণাটির প্রয়োগের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এই তত্ত্বটি কার্যকর করা হলে অনেক সময়ই শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু দেখা যায় যে, এই তত্ত্বটি প্রয়োগের ফলে অনেকসময় যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, শক্তি সাম্য তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারীর ধারণা। শক্তি সাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে এই ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে, কোনো রাষ্ট্রই এই ভূমিকা পালন করতে রাজি হয় না।

তৃতীয়ত, শক্তি সাম্যের ধারণাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে এটা মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে আর ক্ষমতা অর্জন করা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি লক্ষ্য। রাষ্ট্রের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা।

চতুর্থত, সমালোচকগণ বলেন যে, শক্তি সাম্যের ধারণাটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। তাঁরা বলেন, এই তত্ত্বটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করে।

পঞ্চমত, শক্তি সাম্যের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, কোনো একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান করা হলে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হবে। এমনকি এর ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সমালোচকগণ বলেছেন যে, এই ধারণা ঠিক নয়। তাঁরা বলেন, এই ধারণা পোষণ করা হয় যে ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ সাল হল শান্তিময় শতক, কিন্তু ওই শতকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ষষ্ঠত, শক্তি সাম্যের তাত্ত্বিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হল, যে-কোনো রাষ্ট্র সামরিক জোটে অংশগ্রহণ করে বা সামরিক আক্রমণে লিপ্ত হয়ে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু সমালোচকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে বা অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করে বা শিল্পায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে কোনো রাষ্ট্র তার ক্ষমতার প্রসার ঘটাতে পারে।

সপ্তমত, শক্তি সাম্যের তত্ত্বটিকে অপর্যাপ্ত তত্ত্ব হিসেবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। একমাত্র শক্তি সাম্য তত্ত্বের প্রয়োগের দ্বারা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রগুলির স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়গুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অষ্টমত, শক্তি সাম্যের ধারণাটি অনিশ্চয়তা দোষে দুষ্ট। শক্তি সাম্যের ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়। **ইনিস ক্লড** (Inis Claude) মন্তব্য করেছেন যে, শক্তি সাম্যের সমস্যা এর কোনো অর্থ নেই এ নিয়ে নয়, সমস্যা হল এর অনেক অর্থ আছে। তা ছাড়া, শক্তি সাম্য যে একটি অনিশ্চিত ধারণা সে বিষয়ে **মরগেনথাউ** (*Morgenthau*) মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শক্তি সাম্যের ধারণায় বলা হয় যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের শক্তি অত্যন্ত দুরূহ। তা ছাড়া, যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি বিভিন্ন পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়ে গঠিত, সেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার তুলনামূলক পরিমাপ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

দ্বি-মেরুবাদ

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। এতদিন ধরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যে শক্তি সাম্যের ব্যবস্থা কার্যকর ছিল তাকে প্রায় নস্যাৎ করে দেয় এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধ শেষ হলে আন্তর্জাতিক পরিবেশে এক নতুন ধরনের রাজনীতির সৃষ্টি হয়। একে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বি-মেরুকরণ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

7.7 অর্থ ও তাৎপর্য

আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন দুটি বৃহৎ শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে দ্বি-মেরুবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি বিরোধী সমান ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্র বা জোটের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় এবং যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সেই অবস্থাকে দ্বি-মেরুবাদ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

ঠান্ডা লড়াইয়ে আক্রান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে দ্বি-মেরুবাদ ধারণাটি লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মতাদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শিবির এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে পুঁজিবাদী শিবির গঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলিও এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠে তাতে যোগদান করে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। পশ্চিম ইউরোপের বাইরে যে দেশগুলি ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শিবিরে যোগদান করেছিল সেগুলি হল—পাকিস্তান, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, থাইল্যান্ড।

সুতরাং, দ্বি-মেরুবাদ বলতে একটি বিশেষ প্রবণতা এবং অধ্যায়কে বোঝায় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে চিহ্নিত করেছিল। এইসময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শক্তি সাম্যের ধারণাটি দ্বি-মেরুবাদের ফলে বিশ্বকেন্দ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ এই সময়ই সর্বপ্রথম ইউরোপের বাইরে অবস্থানকারী রাষ্ট্রগুলি শক্তি সাম্যের সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীভূত করতে সমর্থ হয়।

■ **মূল্যায়ন :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বি-মেরুবাদ একসময় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেই কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একদল বিশেষজ্ঞগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, দ্বি-মেরুবাদ শক্তি সাম্য রক্ষার একটি চরম ব্যবস্থা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ধরনের দ্বি-মেরুবাদের উদ্ভব হয় তাকে কোনোভাবেই কঠোর দ্বি-মেরুবাদ হিসেবে

অভিহিত করা যায় না। এই সময় একধরনের শিথিল বা ঢিলেঢালা ধরনের দ্বি-মেরুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থাকে কখনোই পূর্ণাঙ্গ দ্বি-মেরুবাদ বলে অভিহিত করা যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বি-মেরুবাদ একটা স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়। কারণ এইসময় কোনো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কিন্তু এর জন্য দ্বি-মেরুবাদ বিশ্বব্যবস্থা যে দায়ী তা অনেকেই মানতে রাজি নন। তাঁরা বলেন যে, এর জন্য দায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের পরিবর্তিত মানসিকতা। পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে মানবজাতির ধ্বংস নিশ্চিত। এই ধারণাই তাদের বিরাট আকারের যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করেনি।

তা ছাড়া, দ্বি-মেরুবাদের অভ্যন্তরে পরিলক্ষিত অনৈক্য এই ধারণাটিকে ক্রমশ স্তিমিত করে তুলেছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে বহুকেন্দ্রিকতা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্যে ফাটল ধরায়। গণ প্রজাতন্ত্রী চিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব মানতে নারাজ হয়। অনুরূপভাবে দেখা যায়, পুঁজিবাদী শিবিরে ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনও দ্বি-মেরুবাদকে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক—কোনো শিবিরেই যোগদান না করে জোট নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে।

১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে বিস্তর পট-পরিবর্তন ঘটে তা দ্বি-মেরুবাদকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাজতন্ত্রের বিদায়, দুই জার্মানির ঐক্য সাধন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা দ্বি-মেরুবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

বহুমেরুবাদ

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেরুর ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকারের মেরুর ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতা বিভাজনের একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই মেরুর ধারণা অনেক রকমের হতে পারে। বহুমেরুবাদ হল এরকম একটি মেরুর ধারণা।

7.8 অর্থ ও তাৎপর্য

বহুমেরুবাদ বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেকগুলি ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র বা জোটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন দুই-এর বেশি রাষ্ট্র বা জোট দ্বারা আবর্তিত হয়, তখন তাকে বহুমেরুবাদ বলে। তবে এই রাষ্ট্রের সংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে **মর্টন এ. ক্যাপলান** (Morton A. Kaplan)-এর ধারণা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, বহুমেরুবাদ তখনই উদ্ভব হয় যখন দুই-এর বেশি, কিন্তু পাঁচটি অথবা অন্তত তিনটি রাষ্ট্র বা জোট দ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত হয়।

7.8.1 *বৈশিষ্ট্য*

বহুমেরুবাদ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়। এগুলি হল—

(১) এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি বৃহৎ শক্তির সমাবেশ ঘটে। এই শক্তিগুলির প্রায় প্রত্যেকেই সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়।

(২) উপরিউক্ত কারণে কারোর একার পক্ষে অন্য কারোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।

(৩) সংখ্যাগত দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় বহুমেরুবাদ ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। কারণ, এখানে জোটের সংখ্যা ও চেহারা প্রায়ই বদলায়।

(৪) বহুমেরুবাদ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অতিক্রমশীল আনুগত্য। অর্থাৎ, একটি শিবিরের সঙ্গে যুক্ত কোনো রাষ্ট্র অনায়াসে অন্য শিবিরে যোগদান করতে পারে এবং সেই শিবিরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে।

(৫) বহুমেরুবাদ ব্যবস্থা অনেক বেশি স্থিতিশীল। এই ব্যবস্থার গোষ্ঠী বা শিবির পরিবর্তন করার অনেক বেশি সুযোগ দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইচ্ছেমতো গোষ্ঠী বা শিবিরে যোগদান করতে পারে।

(৬) বহুমেরুবাদ ব্যবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকে। ফলে এই ব্যবস্থায় যুদ্ধ সংঘটিত হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই কারণে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া এই ব্যবস্থায় বাঞ্ছনীয়।

7.9 বর্তমান বিশ্ব কি বহুমেরুবাদ?

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় একটি বিতর্ক সূচিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীকে কি বহুমেরুবাদ চরিত্রবিশিষ্ট বিশ্ব হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে? এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির ফলে ১৯৯০-এর দশকের গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হতে শুরু করে। এইসময় থেকে অনেকেই বলতে শুরু করেন, এইসময় থেকেই বিশ্বে বহুমেরুবাদ দেখা যেতে থাকে। এইসময় অনেকগুলি শক্তিশালী দেশ আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এরা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণ প্রজাতন্ত্রী চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান। জার্মানি, ব্রাজিল বা ভারতের ন্যায় রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবি করে। কিন্তু এরপর বেশ কিছু ঘটনার মাধ্যমে দেখা যায় যে সমগ্র বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধ করার অভিপ্রায়ে আফগানিস্তান, ইরাক-এ মার্কিন সামরিক অভিযানের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে লিবিয়ার অভ্যন্তরীণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই। এজন্য বলা যায় যে, বর্তমানে একমেরু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বহুবাদমেরুবাদ নয়।

8.3.1 পররাষ্ট্র নীতির হাতিয়ার হিসেবে প্রচারের ভূমিকা

প্রচারকে পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি কৌশল হল প্রচার। প্রাচীন কাল থেকে প্রচারের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মূলত দেশের জাতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে প্রচারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল থেকে নিজের দেশের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রচারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রচারের ততটা গুরুত্ব ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় থেকেই প্রচারের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের কলাকৌশলেরও উন্নতি সাধন হয়।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ যে ধর্মীয় মহাসভা আহ্বান করত, সেখানে ধর্মীয় বাণী প্রচার করা হত। এখান থেকেই প্রচারের ধারণাটি এসেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রচার বলতে বোঝানো হয় একটি সংগঠিত প্রয়াসকে যার দ্বারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করা হয়। **কে. জে. হোলস্তি** (K. J. Holsti)-র মতে, প্রচার বলতে বোঝায় যোগাযোগের মাধ্যমগুলির স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহার যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাদের চিন্তাধারা, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন, সংশোধন বা নিজের অনুগামী করতে সচেষ্ট হয়।

টেরিন কোয়ালটার (Terene Qualter) বলেছেন, প্রচার হল একটি ইচ্ছাকৃত প্রয়াস যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য কোনো গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগের কতকগুলি হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় যার দ্বারা কোনো বিশেষ অবস্থায় যাদের প্রভাবিত করা হয় তাদের প্রতিক্রিয়া যেন প্রচারকারীর ইচ্ছানুযায়ী হয়।

জোসেফ ফ্রাঙ্কেল (Joseph Frankel) এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, সরকারের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। এগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কিছু সুসংহত প্রয়াস গ্রহণ করে থাকে। এর দ্বারা কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মন, অনুভূতি ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করা হয়ে থাকে। একেই প্রচার বলা হয়।

পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল কূটনীতি। কিন্তু কূটনীতি ও প্রচারের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল—

(১) কূটনীতি মূলত দুটি দেশের সরকারের মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু প্রচার জনগণকে উদ্দেশ্য করে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, প্রচারের মাধ্যমে একদিকে যেমন অন্য রাষ্ট্রের জনগণকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়, তেমনি এর দ্বারা নিজের দেশের জনগণকেও প্রভাবিত করা হয়ে থাকে।

(২) স্বার্থকে কেন্দ্র করেই প্রচারকার্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এখানে মূল্যবোধের কোনো স্থান থাকে না। প্রচারকারী কেবল নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা ভাবেন। অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা কোনোভাবেই ভাবা হয় না। কিন্তু কূটনীতিতে পরার্থপরতা ও মূল্যবোধের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রচারের মাধ্যমে কেবল প্রচারকারী রাষ্ট্রের স্বার্থকে চরিতার্থ করার প্রয়াস গৃহীত হয়। এই কারণে প্রচারের ভূমিকাকে নেতিবাচক হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু কূটনীতির ভূমিকা এরূপ নেতিবাচক নয়।

প্রচার ও কূটনীতির মধ্যে উপরিউক্ত এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে উভয় ধারণাই জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে পরিচালিত হয়। তা ছাড়া, এদের মধ্যেকার পার্থক্য অনেকসময় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কূটনীতি পরিচালনা করার সময় বর্তমানে প্রচারেরও আশ্রয় নিতে হয়। তাই বলা যায় যে, প্রচার ও কূটনীতি হল একে অপরের পরিপূরক।

বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল প্রচার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব যখন ঠান্ডা যুদ্ধ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে সেই সময় থেকেই তৎকালীন দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুদৃঢ় করার অভিপ্রায়ে প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে এই সময় থেকেই পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে প্রচারের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচার চালানো হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে গণমাধ্যমগুলির দ্বারা প্রচার চালানো আরও সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে জনমতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবলমাত্র নিজের দেশের জনগণ নয়, অন্যান্য দেশের জনগণের কথা মাথায় রেখে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয়। আর এই জনমতকে প্রভাবিত করতে প্রচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রচারের বিষয়টি চরিতার্থ করার জন্য কতকগুলি কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। প্রচারের সার্থকতার জন্য প্রচারকারীকে তার লক্ষ্যবস্তু কী হবে এবং কোন্ স্থানে প্রচার চালাতে হবে সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। প্রচার চালানোর অনেকগুলি কৌশল ও পদ্ধতি আছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এগুলি হল—(১) উপস্থাপন করার পদ্ধতি; (২) দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করার পদ্ধতি; (৩) উত্তর বা সাড়া আদায় করার পদ্ধতি এবং (৪) সম্মতি বা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার পদ্ধতি।

(১) উপস্থাপন করার পদ্ধতি : প্রচারকারী কীভাবে প্রচারের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে তার ওপর প্রচারের সাফল্য নির্ভর করে। প্রচারকারী দ্বারা প্রচারিত বিষয়বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তা নির্ভর করে উপস্থাপনের উপর। প্রচারের স্বার্থে প্রচারকারী সত্যও বলতে পারেন, আবার অসত্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। নিখুঁতভাবে যদি কোনো বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা যায় তাহলে তার বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রচারকারীর লক্ষ্য-গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে। উপস্থাপন করার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধি করা যায়। কোনো বিষয়বস্তুকে প্রচারের সময় কয়েকটি উপস্থাপন করার

পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় প্রচারকারী অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবে প্রচারের বিষয়বস্তু পেশ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজটি লক্ষ্য-গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেয়। আবার অনেকসময় 'বড়ো মিথ্যা' (Big Lie)-র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। হিটলারের নাৎসি সরকার অনেকসময়ই এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করত। অনেক ক্ষেত্রে আরও একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। আর সেটি হল প্রচারকারী তার নিজের ভালো দিকগুলি লক্ষ্য-গোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপন করে। অপরদিকে, নিজের মন্দ দিকগুলির ওপর আলোকপাত করে না। সুতরাং বলা যায়, উপস্থাপন করার পদ্ধতির ওপর প্রচারের সার্থকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

(২) **দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করার পদ্ধতি ঃ** দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করার পদ্ধতি দ্বারা প্রচারকারী তার লক্ষ্য-গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে পুরানো পদ্ধতি হচ্ছে প্রচারকারী নিজের শক্তি দেখানোর চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ভারত তার সৈন্যবাহিনীর শোভাযাত্রার মাধ্যমে তার শক্তির কিছুটা পরিচয় বিশ্ববাসীকে দিয়ে থাকে। এ ছাড়া, দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করার আরও কতকগুলি পদ্ধতি আছে। সেগুলি হল—পত্র প্রদান, বক্তৃতা দান, সভার আয়োজন করা। তবে বর্তমানে যে পদ্ধতিটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে সেটি হল বিদেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিশন দ্বারা সেখানকার অধিবাসীদের প্রচারের মাধ্যমে আকর্ষিত করা। তা ছাড়া, নিজের দেশের ভাবমূর্তি অন্য দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের প্রধান বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিজেদের দেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

(৩) **উত্তর বা সাড়া আদায় করার পদ্ধতি ঃ** প্রচারকারী তার লক্ষ্য-গোষ্ঠীর উত্তর বা সাড়া আদায়ের জন্য অত্যন্ত সচেতন থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মানবমনের আবেগকে এ ক্ষেত্রে প্রচারকারী কাজে লাগায়। জাতীয়তাবাদ, ন্যায়, যুক্তি ইত্যাদিকে ব্যবহার করে মানুষের মনের গভীর অনুভূতিকে সাড়া জাগানোর চেষ্টা চালানো হয়। এটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে প্রচারকারী স্লোগানের ব্যবহার করে। এ ছাড়া, বিশেষ কোনো চিহ্ন বা পতাকার ব্যবহারও করা হয়ে থাকে। মানুষের মনে এগুলির প্রভাব নিঃসন্দেহে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

(৪) **সম্মতি বা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার পদ্ধতি ঃ** প্রচারকারী তার লক্ষ্য-গোষ্ঠীর সম্মতি বা গ্রহণযোগ্যতা আদায় করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটিকে সার্থক করার জন্য প্রচারকারী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় দেখা যায় প্রচারকারী তার লক্ষ্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের সাদৃশ্যকে তুলে ধরে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্যের কথা বলে এ রূপ সম্মতি অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। তা ছাড়া, নীতিবোধ, ন্যায়বিচার, মূল্যবোধ, ভগবান, ইতিহাস বা মহান মানুষদের আদর্শের কথা বলে প্রচারকারী তার লক্ষ্য-গোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

বর্তমানকালে প্রচারের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একসময় সরকারই কেবলমাত্র প্রচারের সঙ্গে যুক্ত থাকত। কিন্তু এখন বেসরকারি সংস্থা এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিও প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রচারের মাধ্যমে এরা সরকার এবং জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। প্রচার পৃথিবীর অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছে। সকলে একই সঙ্গে সুখ-দুঃখ- আনন্দ-বেদনার দ্বারা গ্রথিত হয়েছে। তবে প্রচারের কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার হিসেবে প্রচার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণে সহায়তা করছে। প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি তাদের কার্য পরিচালনা করছে। তা ছাড়া, প্রচারের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করতে আর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার এবং

ভোগবাদী স্পৃহাকে শক্তিশালী করতে প্রচারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ সব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, প্রচার ব্যবস্থার সার্থকতার ওপর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে।

8.4 পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতির ভূমিকা

কূটনীতিকে এক প্রাচীন পন্থা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। পররাষ্ট্রনীতিকে বাস্তবে রূপায়ণ করার এক প্রাচীন বলা হল এই কূটনীতি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হল কূটনীতি। প্রাচীন কাল থেকে কূটনীতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থুসিডাইডিস (Thucydides)-এর লেখনীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালের গ্রিক নগররাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া, ভারত, রোম, মিশর ইত্যাদি দেশগুলি কূটনীতির ওপর আস্থা রাখত। কিন্তু স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন বলতে যা বোঝায়, সে সময় তা দেখা যেত না। স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন স্থাপিত হয় ষোড়শ শতকে। পরের শতকে কূটনীতি একটি পেশায় পরিণত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জনমতের প্রতি গুরুত্ব দান, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কূটনীতি বর্তমান শতকে এসে উপনীত হয়েছে।

নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনাকে কূটনীতি বলা হয়ে থাকে। তবে কূটনীতির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ কূটনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। **নরমান ডি. পামার এবং হাওয়ার্ড সি. পারকিন্স** (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins) বলেছেন, পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে কূটনীতি হাতিয়ার ও ব্যক্তিবর্গ প্রদান করে থাকে। তাঁরা আরও বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার স্বাভাবিক উপায় হল কূটনীতি। **আরনেস্ট স্যাটেউ** (Earnest Sataw)-এর মতে, স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে বুদ্ধি এবং কৌশলের প্রয়োগই হল কূটনীতি। **মরগেনথাউ** (Morgenthau), **জর্জ কেনান** (George Kenan), **জোসেফ ফ্রাঙ্কেল** (Joseph Frankel) প্রমুখ সকলেই একই মত পোষণ করেছেন যে, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগসাধনের হাতিয়ার হল কূটনীতি।

বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল কূটনীতি। বর্তমানকালে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক রক্ষার্থে কূটনীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই কারণে বলা হয়, আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কূটনীতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

হ্যান্স জে. মরগানথাউ (Hans J. Morgenthau) কূটনীতির চারটি কাজের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের লক্ষ্যগুলি শনাক্তকরণ করতে চায়। আর এটি-ই হল কূটনীতির প্রধান কাজ। তবে রাষ্ট্রকে এই লক্ষ্য স্থির করতে হবে নিজের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। যদি তা না করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই কারণেই মরগেনথাউ বলেছেন, জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণ করতে হবে ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে।

(২) কেবলমাত্র নিজের রাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলি শনাক্তকরণ করলেই হবে না, অন্য রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্যগুলিও শনাক্তকরণ করাও কূটনীতির কাজ। তা ছাড়া, অন্য রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষমতাকেও যাচাই করে দেখতে হবে। দক্ষ কূটনীতির কাজ হল অন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন করা। যদি তা না করা হয় তাহলে নিজের রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে।

(৩) কূটনীতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষ্যগুলির মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তা দেখা। অর্থাৎ, অন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও ক্ষমতার সঙ্গে নিজের রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করাই হল কূটনীতির কাজ।

(৪) নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত উপায় বা পন্থা অনুসরণ করা। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একক ভাবে শক্তির প্রদর্শন বা একক ভাবে আপসের নীতি অনুসরণ করলে সার্থকতা অর্জন করা যায় না। সেজন্য কূটনীতিকে প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে শক্তির প্রদর্শন এবং আপসের নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা একান্তভাবেই আবশ্যিক।

কূটনীতির কার্যাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি আলোচনা করা দরকার। কূটনীতিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। **মরগেনথাউ** তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে প্রতিনিধিদের তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব ঃ প্রতীকী প্রতিনিধি হিসেবে কূটনীতিবিদদের কতকগুলি প্রতীকী দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেই কারণে যে দেশে তাঁরা নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন সেখানকার আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের এবং দেশের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন। তা ছাড়া, ওইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদানপ্রদান করতে পারেন।

(২) আইনগত প্রতিনিধিত্ব ঃ আইনগত প্রতিনিধি হিসেবে কূটনীতিবিদদের অনেকগুলি কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। এই ভূমিকা সঠিক ভাবে পালন করার জন্য কূটনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। নিজের দেশের আইনগত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন। বিবৃতি পেশ করাও তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া, এই কার্যাবলির মধ্যে পড়ে অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত স্বদেশীয়দের সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা করা।

(৩) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ঃ কূটনীতিবিদরা কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে তাঁদের নিজস্ব বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের ওপর। নিজের দেশের পররাষ্ট্রনীতি অন্য দেশে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব বর্তায় কূটনীতিবিদদের ওপর। নিজের দেশের পররাষ্ট্রনীতি যাতে অন্য দেশ দ্বারা সমর্থিত হয় সেদিকে তাঁদের বিশেষ নজর রাখতে হয়। অন্যদিকে, অন্য দেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আর এই বিষয়ে তাঁকে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়, যা তাঁকে নিজের দেশের সরকারের কাছে প্রেরণ করতে হয়। এ ছাড়া, যে দেশে একজন কূটনীতিবিদ অবস্থান করেন, সেই দেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিজের দেশের সরকারকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করেন। এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে তাঁর নিজের দেশ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে।

অন্যদিকে, অনেকটা মরগেনথাউ-এর মতোই **নর্মান ডি. পামার** (Norman D. Palmer) এবং **হাওয়ার্ড সি. পারকিন্স** (Ho ward C. Perkins) কূটনীতিবিদদের চারটি মুখ্য কার্যাবলির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(১) প্রতিনিধিত্ব ঃ কূটনীতিবিদ অন্য দেশে নিজের দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। একজন দক্ষ বিক্রেতার সঙ্গে কূটনীতিবিদের কাজটিকে তুলনা করা যায়। একজন বিক্রেতার দক্ষতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে তিনি দ্রব্য বিক্রি করতে কতখানি সাফল্য অর্জন করবেন। অনুরূপ ভাবে, কূটনীতিবিদের দক্ষতা, নৈপুণ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে তিনি বিদেশে নিজের

দেশের পররাষ্ট্রনীতি কতখানি সাফল্যের সঙ্গে পেশ করতে পারবেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক মেলামেশা তাঁকে অন্য দেশে জনপ্রিয় করে তোলে। এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তিনি যদি সক্ষম হন, তাহলেই কূটনীতিবিদ হিসেবে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

(২) আলাপ-আলোচনা ঃ আলাপ-আলোচনাকে কূটনীতির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। আর এই আলাপ-আলোচনার অস্ত্রকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেন একজন কূটনীতিবিদ। দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা চালানো এবং সঠিক ভাবে মধ্যস্থতা করা একজন সফল কূটনীতিবিদের পরিচায়ক। আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমেই উত্তেজনা প্রশমিত করে শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই আলাপ-আলোচনার কাজটি অত্যন্ত জটিল। একজন দক্ষ কূটনীতিবিদই পারেন সুষ্ঠুভাবে আলাপ-আলোচনার কাজটি সম্পাদন করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের দেশের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে।

(৩) সংবাদ প্রেরণ ঃ যে দেশে কূটনীতিবিদগণ অবস্থান করেন, সেই দেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। এইসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। সেই প্রতিবেদন তিনি নিজের দেশের সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। এই প্রতিবেদনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁর দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে।

(৪) অন্য দেশে নিজের দেশের ও দেশের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা ঃ বিদেশে নিজের দেশের সব রকম স্বার্থ রক্ষা করা একজন কূটনীতিবিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিদেশে নিজের দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্যটন, বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রচার করে থাকেন তিনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। তা ছাড়া, বিদেশে অবস্থিত নিজের দেশের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর থাকে। তাঁর দেশের সরকারের নীতি ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশি সরকারকে অবহিত করেন তিনি।